দৈনিক বাংলা

113

তারিখ 17 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দারিদ্র্য দূর কর, শোষণ নির্মূল কর—আমার কাজ শেষ হবে

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ হুজুর বলতেন—"দারিদ্রকে শেষ করে দাও, শোষণকে নির্মূল করে দাও, সবার মুখে হাসি ফোটাও, আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে।"

সেই হুজুর, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, শতাব্দীর মহানায়ক, মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর আজ ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী। ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারক-বাহক মওলানা ভাসানীর সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা সম্ভোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাজার প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে এই দিনটি। মওলানা ভাসানীর হাজারো ভক্ত, অনুসারী, শিষ্য ও পাকিস্তানসের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রীদের পদভারে সম্ভোষ আজ মুখরিত।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, আসামের লাইন প্রথা বিরোধী আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী, বহুবার কারাভোগের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ মওলানা ভাসানীই সর্বপ্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি। ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলন। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী সম্মেলনে সর্বপ্রথম পাকিস্তানীদের 'আসসালামু আলায়কুম' জানানোর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আহ্বান জানান। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সনের ৩০ নবেম্বর এক প্রচার পত্রের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আজ আমি পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি বাঙ্গালীকে তাদের জীবন মরণ প্রশ্নের বিষয়টি পুনরায় এবং শেষবারের মতো দলমত নির্বিশেষে ভাবিয়া দেখিতে আকুল আবেদন জানাইতেছি। বিগত ২৩ বছর তো বটেই এমনকি চলতি ১৯৭০ সালটিকেই শুধু যদি আমরা

মওলানা ভাসানীর মাজার —দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

তারিখ 17 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যাচাই করিয়া দেখি তবে নিঃসন্দেহে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পরিব। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট হইতে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানীদের আজাদী লড়াই নতুনতম এবং শেষ পর্যায়ের রূপলাভ করিবার অপেক্ষায় আছে মাত্র। বাঙ্গালী-জাতির মুক্তির সংগ্রামকে রুখিতে পারে পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই। সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত।"

সেই মহান নেতা কৃষক-শ্রমিকের দরদী বন্ধু মওলানা ভাসানী আজ সন্তোষে চিরনিদ্রায় শায়িত। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে তিনি সন্তোষে স্থাপন করেছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। ভাসানী সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "আজকাল মাদ্রাসা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় ইসলামী শিক্ষা তাহা নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা আজকের দুনিয়ার সঙ্গে শুধু তাল মিলাইয়াই নয়, অগ্রগামী হইবার জন্য বিশেষ যত্নসহকারে কারিগরি শিক্ষা লাভ করিবে। তাঁতের কাজ, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ, মাছের চাষ, রেশম চাষ, মৌমাছি চাষ, গাছ-গাছড়া, ফুল ও ফল বাগান, সবজি চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগীর খামার, রাজমিস্ত্রী ও ছুতার মিস্ত্রীর কাজসহ যাবতীয় কারিগরি শিক্ষা ছাত্রছাত্রীরা লাভ করিবে এবং ইহাদের কমপক্ষে একটি বিষয় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক থাকিবে।" মওলানা ভাসানী বিশ্বাস করতেন এবং বলতেন যে "ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামে গ্রামে কাজ করিবার জন্য নিয়োজিত থাকিতে হইবে। ইসলাম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি নরনারীর জন্য জ্ঞান-অর্জনকে যায়েজ বলিয়া গণ্য করে ও শ্রমকে চূড়ান্ত মর্যাদাদান করে, এমনকি প্রতিটি পেশাকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করে। এই জ্ঞান কেবল পুঁথিগত জ্ঞান নয়, যে জ্ঞান মানুষের হৃদয়কে তাজা রাখে, বুদ্ধিকে সক্রিয় করে, শ্রমের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাশীল করিয়া তোলে এবং দেহকে উৎপাদনমূলক কাজে নিয়োজিত রাখে—ইসলাম প্রতিটি নরনারীকে সেই জ্ঞানের অনুসারী করিতে চায়। এইনিক দিয়া বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামের সামগ্রিক জীবনদৃষ্টির কোন সম্পর্ক নাই। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি না করিয়া শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে, মনিব-গোলামের সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে। যেমন বলিয়াছে—নিবিচারে অর্থনৈতিক শোষণ ও জুলুম জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমাজবিরোধী এবং মানবতাবিরোধী কর্মের অন্ধ অনুকরণ, নির্লজ্জ বিলাসিতা ওভঁশৃঙ্খলতা।"

এই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সনের ৮ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দেন সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। ১৯৭০ সনের ৮ সেপ্টেম্বর সন্তোষের বিশাল শিক্ষা সম্মেলনে 'আমার পরিকল্পনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নামে একটি বিসিস উপস্থাপনা করেন।' এইদিনই সন্তোষে ঐতিহাসিক দরবার হল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি প্রেস ও সাধারিক হক কথার উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য চীনের প্রেসিডেন্ট মাও সেতুং মওলানা ভাসানীকে একটি ট্রাক্টর এবং শান্তি প্রেসের জন্য ছাপার যন্ত্রপাতি উপঢৌকন দেন।

১৯৭৪ সন থেকে তিনি পর্যায়ক্রমে সন্তোষে শিশু স্কুল, পীর শাহজামান হোস্টেল, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বালিকা হাইস্কুল, রাবেয়া বসরী হোস্টেল, ই বি বালক হাইস্কুল, শাহ এনায়েতউল্লাহ হোস্টেল, ই বি টেকনিক্যাল কলেজ, হাসান বারী হোস্টেল, ই বি তালিমাতে কোরআন ও সুন্নাহ, শাহ নাসিরউদ্দিন বোগদাদী হোস্টেল, শাহ নাসিরউদ্দিন বোগদাদী ইয়াতিমখানা, হাঁসমুরগী প্রশিক্ষণ খামার, ই বি সুচীশিল্প স্কুল, ই বি কমিউনিটি স্কুল, মৌমাছি চাষ প্রকল্প, উইভিং ফ্যাক্টরী, কৃষি, মৎস্য ও উদ্যান প্রকল্প, জোগ্যগণ্য সরবরাহ কেন্দ্র, বহুমুখী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়াকফ ও ক্রয়সূত্রে ৩৫৫৩ একর অর্পিত সম্পত্তি ৩৮৭৫ একর খাস সম্পত্তি, ২২৯১ একর এবং সড়ক ও জনপথ বিভাগের খাস ১৪৫৫ একরসহ মোট ১১০৮৯ একর জমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠান ছাড়াও ১২টি মাছচাষের পুকুর, একটি বিশাল লেক, ৩টি পোনা মাছের জন্য নার্সারী পুকুর, ২৯৫টি ফলবান বৃক্ষ সংবলিত ৩টি বাগানও এর আওতায় রয়েছে। ট্রাস্টী বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত এ সকল পুকুর, জমি ও বাগান থেকে প্রতি বছর প্রায় গড়ে দুই লাখ টাকা আয় হয়। এ সকল সম্পদ ছাড়াও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে গেরুপুর জেলার নালিতাবাড়ি থানার গুনতাবাগবেড়ে মৌজার লাল মামুদ মন্ডল এক একর ৩৫ শতাংশ জমি ওয়াকফ করে দেন। যা বর্তমানে একটি মামলা চলার কারণে গেরুপুর জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। লাল মামুদ মন্ডলের মৃত্যুর পর তার ছেলেরা ওয়াকফ-এর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে। তাছাড়া সন্তোষ এলাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ শতাংশ জমি অদ্যাবধি উদ্ধার সম্ভব হয়নি।

কৃষকের বন্ধু, শ্রমিক দরদী, মহান নেতা মওলানা ভাসানী চিরদিনই সাদামাঠা জীবন যাপন করেছেন। তিনি বলতেন, "আমার বাবার ছিল সাত বিঘা জমি আর একটি নোকান। আমি চিরকাল পান্তাভাত খেয়ে এসেছি, এখনো খাচ্ছি—। আমার নিজের তো কিছুই নাই।". মওলানা ভাসানীর সমগ্র জীবনে এই কথারই যাথর্থ প্রতিফলন দৃশ্য করা গেছে। এতবড় বিশাল জমিদারী ওয়াকফ এস্টেট উদ্ধারের পরও তিনি থাকতেন একটি ছোট্ট জীর্ণ কুঁড়েঘরে।

পরবর্তীকালে তার মৃত্যুর পর বেগম আলেমা ভাসানীর থাকার জন্য সরকারীভাবে "ভাসানী ভবন" নামে একটি একতলা বাড়ি নির্মাণ করা হয়।

জীবনমুখী শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা ছিল মওলানা ভাসানীর

সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রবেশ দ্বার —দৈনিক বাংলা